The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXVI, No. 2, pp 135-153
ISSN 2306-3920, DOI :

ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর মিশনারী কার্যক্রমের প্রভাব : প্রেক্ষিত দিনাজপুর জেলা

মোঃ রবিউল ইসলাম*

[**সার-সংক্ষেপ :** বাংলাদেশের উত্তরের জেলা দিনাজপুরে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের মধ্যে মিশনারী কার্যক্রমের প্রভাব বিস্তৃত এবং তা তাদের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ভাষাগত এবং সামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করছে। মিশনারী কার্যক্রম এ সকল নৃগোষ্ঠীর জীবনধারায় বিশেষকরে সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল, মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে দিনাজপুর জেলার ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের সংস্কৃতি ও সমাজে ঘটে যাওয়া এসব পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা। গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান হয় যে, মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতি কিছু সংরক্ষিত হলেও, আধুনিকতা এবং ধর্মান্তরের কারণে তাদের অনেক ঐতিহ্য হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে মিশনারীরা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের কিছু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণে সহায়তা করেছে। তবে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে, এসব ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্য, ভাষা ও বিশ্বাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। গবেষণায় আরও প্রতিফলিত হয়েছে যে, মিশনারীরা নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের সাঁওতালি ও কুরুখ ভাষায় বাইবেল অডিও এবং অ্যাপ্লিকেশন আকারে নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে সরবরাহ করেছে। মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিও সাধিত হয়েছে। তবে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মতে, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং সামাজিক সমন্বয়ের দিকে আরও অধিক মনোযোগ দেয়া হলে, এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।]

ভূমিকা:

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস দীর্ঘকাল ধরে তাদের পরিচয়ের ভিত্তি হয়ে আছে। এই গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজস্ব জীবনধারা, আচার-অনুষ্ঠান এবং বিশ্বাসের ওপর জীবনযাপন করে থাকে। কিন্তু ইতিহাসের নানা সময়ে বহিরাগত শক্তির প্রভাবে তাদের সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্তন এসেছে। মিশনারী কার্যক্রম যা মূলত ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে শুরু হলেও পরবর্তীতে তা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর গভীর

* **মোঃ রবিউল ইসলাম:** প্রভাষক, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, ই-মেইল: rabiul@his.brur.ac.bd

প্রভাব ফেলেছে। মিশনারীদের আগমনের ফলে একদিকে যেমন নতুন ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রচার হয়েছে তেমনি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানে পরিবর্তন এসেছে (Bosch, 2011; Hiebert, 2009)।

বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায়, মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে বহু ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় জীবনধারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর অঞ্চল বিশেষ করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাংলাদেশ এবং নেপালের কিছু অঞ্চলে মিশনারীদের কার্যক্রমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিরা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিল। কিন্তু মিশনারীরা তাদের নানা প্রকার কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলে, এসব গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন ধর্মীয় চেতনার জন্ম হয়। এর ফলে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও ঘটতে থাকে (Verma, 2024)।

বাংলাদেশে বাঙালি জনগণের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী বসবাস করছে, যাদের রয়েছে স্বতন্ত্র ভাষা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান ও জীবনধারা। এই সকল জাতিগত গোষ্ঠী নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং আর্থ-সামাজিক সংগঠনেও তাদের নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তরের বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেট, উত্তর-পশ্চিমের বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া এবং পাবনা জেলা এই ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের প্রধান আবাসস্থল। এদের মধ্যে চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, মাহালী, মালো, মাহাতো, পাহাড়ি, মালপাহাড়ি, গারো, খাসিয়া, মণিপুরী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীরা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলেছেন এবং তা দেশের জাতীয় কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তবে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জীবনধারা আজ হুমকির সম্মুখীন, যেখানে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

বাংলাদেশের যেসকল অঞ্চলে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির বসবাস, সেসকল অঞ্চলে বহু বছর ধরে বিভিন্ন মিশনারী ও তাদের কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়। উত্তরবঙ্গ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল যেখানে ওঁরাও,সাঁওতাল, মাহালী, রাজবংশী, রবিদাস, মুন্ডা, মাহাতো এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির বসবাস রয়েছে। যারা তাদের নিজস্ব ভাষা, ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর জেলায় মিশনারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উইলিয়াম কেরী ১৭৯৬ সালে দিনাজপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফার্নান্ডেজ নামক একজন পর্তুগিজ মিশনারিকে এর তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন (আলী, ২০০২)। পরবর্তী সময়ে (১৭৯৯-১৮০৫) উক্ত চার্চের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় ধর্মান্তরিত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২টি ভার্নাক্যুলার বোর্ডিং স্কুল (১টি বালক অপরটি বালিকা) প্রতিষ্ঠিত হয় (বাংলা পিডিয়া, ২০১৫)। মিশনারীরা যেমন ধর্মীয় শিক্ষা এবং কল্যাণমূলক কাজের জন্য এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল, তেমনি তারা স্থানীয় জনগণের মধ্যে নতুন ধর্মচর্চা, স্কুল প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল নির্মাণ এবং অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম চালাতে থাকে। তবে এই প্রভাব শুধু সমাজে উন্নয়ন ও সুবিধা আনেনি, বরং এর ফলে স্থানীয় সংস্কৃতির কিছু দিকেও পরিবর্তন এসেছে (Clarence et al., 2022)। অনেক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি তাদের পুরনো ধর্মীয় বিশ্বাসকে ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে, যার ফলে তাদের আচার-অনুষ্ঠান, ভাষা এবং সামাজিক কাঠামোতে নানা পরিবর্তন ঘটেছে (De Rozario, 2011; Hiebert, 2009; Shikdar, 2020)।

তবে মিশনারী কার্যক্রমের প্রভাব নেতিবাচক ছিল না। মিশনারীদের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়, যা স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। মিশনারীরা স্থানীয় জনগণের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং

উন্নয়নমূলক কাজ করে নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর সদস্য নতুন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের পুরনো বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছে। এই পরিবর্তন তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা এবং আচার-অনুষ্ঠান থেকে ক্রমশ দূরে নিয়ে এসেছে, যার ফলে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত থাকার ক্ষেত্রে একটি গভীর শূন্যতার সম্মুখীন হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন সমাজে আধুনিকতার নতুন ধারার সূচনা হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে পুরনো সংস্কৃতির প্রতি অবহেলা ও সংকটও সৃষ্টি হয়েছে (Verma, 2024)। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এই পরিবর্তনটি শুধু সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নয়, ভাষাগত ও আচার-অনুষ্ঠানেও লক্ষণীয়। মিশনারীরা অনেক সময় স্থানীয় ভাষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য ভাষার ব্যবহারে উৎসাহিত করেছিল, যা স্থানীয় জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অবহেলা সৃষ্টি করেছে। তবে কিছু অংশে স্থানীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃতি এখনও রক্ষা পেয়েছে, যা মিশনারী কার্যক্রমের প্রভাবের মাঝেও সংরক্ষিত আছে (Hiebert, 2009)। মিশনারী কার্যক্রমের ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, যা গভীর গবেষণার দাবি রাখে। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ওপর মিশনারী কার্যক্রমের প্রভাবে, এই গবেষণা শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিবর্তন বা সংস্কৃতির সংকট নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এটি সেই পরিবর্তনগুলির সংরক্ষণ এবং আধুনিকতার সাথে সঠিক সমন্বয়ের দিকেও গভীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে। এই গবেষণায়, আদিবাসী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলিতে আসা পরিবর্তনগুলি কীভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবন ও সমাজে প্রভাব ফেলেছে, তা বিশ্লেষণ করা হবে। তাছাড়া, আধুনিক সমাজের সাথে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সমন্বয় এবং এসব সংস্কৃতির সংরক্ষণে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ বিদ্যমান, সেই বিষয়েও আলোকপাত করা হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর মিশনারী কার্যক্রমের প্রভাব বিশ্লেষণ করা। অর্থাৎ, এ গবেষণায় মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে এসব সম্প্রদায়ের ভাষা, উৎসব, নাচ, গান, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ধর্মীয় রীতিনীতি কি ধরনের পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে তা অনুসন্ধান করা হবে।

ওঁরাও জাতির পরিচয়:

ওঁরাও জাতিসত্তা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত বিদ্যমান। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, তারা অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, অপরদিকে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাদের দ্রাবিড় ভাষাভাষী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (জলিল, ২০০৩)। এই কারণে অধিকাংশ গবেষকের ধারণা, ওঁরাওরা দ্রাবিড় ভাষাভাষী কুড়ুখ জাতির উত্তরসূরি Colonel Dalton, Sir George Grierson, Dehon, Grignard প্রমুখ গবেষক মত প্রকাশ করেছেন যে 'ওঁরাও' শব্দটি 'কুড়ুখ' শব্দের অপভ্রংশরূপ।

Colonel E.T. Dalton -এর মতে, Kudukh is derived from konkan which is supposed to have been the cradle of the oraons. আবার Sir George Grierson বলেন, Hindus say that the word 'Orao' is simply indo- aryan 'urau' spendthrift, the name being an allusion to the alleged thriftless character of the people to whom it is applied (Grierson, 1967; Kujur, 1989).

ওঁরাওদের আদি বাসস্থান ছিল ভারতের উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর ও রাজমহল অঞ্চলের পার্বত্য এলাকাগুলোতে। ঠিক কখন এবং কেন তারা বাংলাদেশে এসেছিল তার নির্দিষ্ট কারণ জানা না গেলেও, মনে করা হয় মুঘল শাসনামলে তারা ভারতে তাদের আদি বাসস্থান থেকে বরেন্দ্র অঞ্চলে

প্রবেশ করে। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর তথ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসরত ওঁরাওদের সংখ্যা ৮৫৮৫৮ যাদের মধ্যে দিনাজপুরে বসবাস করছে ৪১৮৪ জন (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২২)।

ওঁরাওরা মূলত জড়োপাসক, তবে তাদের সমাজে হিন্দু ধর্মের প্রভাবও বিদ্যমান। তাদের প্রধান দেবতা ধরমী বা ধরমেশ, যিনি তাদের বিশ্বাসে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান (তরু, ২০০৭)। তিনি সূর্যে অধিষ্ঠিত, তাই সূর্যও তাদের কাছে দেবতা হিসেবে পূজিত। ধরমেশকে সন্তুষ্ট রাখতে তারা 'ডানডাকাঁটা' উৎসবসহ বিভিন্ন পূজা আয়োজন করে, যার মাধ্যমে অমঙ্গল ও অনিষ্ট দূর করার প্রতীকী প্রচেষ্টা করা হয়। এছাড়া তারা গ্রাম্যদেবতা, গার্হস্থ্য দেবতা, ফসল ও রোগ-নিরাময়ের দেবতা প্রভৃতির পূজাও করে থাকে। হিন্দু ও সাঁওতাল দেবদেবীদের প্রতিও তাদের শ্রদ্ধা রয়েছে। পূজা-পার্বণে তারা নৃত্য, সংগীত ও মদ্যপানের মাধ্যমে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে এবং নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রশাসক ও নৃবিজ্ঞানী Colonel E.T. Dalton- এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য The doctrine of the Oraons is, that man best pleases the gods when he makes merry himself, so that acts of worship and propitiatory sacrifices are always associated with feasting, drinking, dancing and love-making (Dalton, 1872)".

ওঁরাওরা তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করে, যাকে তারা 'পাকবালার' বলে−অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের অশরীরী আত্মা। তাদের ধারণা, এসব আত্মাই জীবিতদের আদর্শ ও ঐক্যের পথে শক্তি জোগায় এবং আশীর্বাদ প্রদান করে। তাই ওঁরাওরা পূর্বপুরুষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। উদাহরণ স্বরূপ, তারা ভাত খাওয়ার আগে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে অল্প অংশ উৎসর্গ করে এবং নবজাতকের নাম প্রায়ই পূর্বপুরুষদের নামে রাখে আশীর্বাদের আশায়। তারা 'নাদ' বা প্রেতাত্মার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করে, যাদেরকে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়। এসব আত্মাকে শান্ত রাখতে ওঁরাওরা তাদের উদ্দেশ্যে পূজা আয়োজন করে। তদুপরি, হিন্দু ধর্মের প্রভাবে অনেক ওঁরাও লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর পূজাও পালন করে।

ওঁরাওরা নিজেদের 'কুরুকার' (কঁৎঁশধৎ) বলে পরিচয় দেয়, এবং তাদের ভাষার নাম 'কুরুক', যা দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ভাষাগতভাবে কুরুকের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কিছু জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে কানাড়া ভাষার, ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। কুরুক ভাষার নিজস্ব কোনো লিপি নেই; এর সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে মৌখিক। তবে তাদের বিশ্বাস, অতীতে একটি লিপি ছিল যা কালের প্রবাহে বিলুপ্ত হয়েছে (তরু, ২০০৭)। বাংলাদেশে বসবাসরত ওঁরাওরা কুরুকের পাশাপাশি শাদরী ভাষাতেও কথা বলে। কুরুক যেখানে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর, সেখানে শাদরী উপভাষাটি ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

ওঁরাও সমাজের জীবনযাত্রা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস ও অলংকারে তাদের নান্দনিক রুচি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় স্পষ্ট। বিশেষ করে ওঁরাও রমণীরা নাকফুল (কারমা শিকড়ি), পায়রা, মুন্দী, ও চুলের খোঁপায় রূপার কাঁটা (খংশ) প্রভৃতি অলংকারে নিজেদের সজ্জিত করেন (তরু, ২০০৭)। তাদের গৃহসজ্জায়ও নান্দনিকতা প্রকাশ পায়−দেয়ালে গাছ, লতা-পাতা, ফুল ও পাখির নকশা আঁকার প্রচলন রয়েছে। শিকার ও বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ ওঁরাওদের প্রাচীন ঐতিহ্যের অংশ। তাদের তৈরি প্রধান বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে ঢোল, মাদল, বাঁশি, নাগারা, খঞ্জনী ও ঘুটুর; সাম্প্রতিককালে তারা হারমোনিয়ামও ব্যবহার শুরু করেছে। ওঁরাওরা সারহুল, কারাম, ফাগুয়া ও সোহরাইসহ বিভিন্ন উৎসব জাঁকজমকভাবে উদযাপন করে। জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু কেন্দ্রিক নানা আচার-অনুষ্ঠানও তাদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহসংক্রান্ত রীতির মধ্যে কুটুমেত, বড়িপাড়া ও মাড়োয়া উল্লেখযোগ্য (জলিল, ২০০৩)। ওঁরাওদের লোকসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ−তাদের গান, ছড়া ও ধাঁধা-তে প্রেম, প্রকৃতি, ধর্ম, উৎসব, জীবন ও মৃত্যুর নানা দিক প্রতিফলিত হয়েছে। এসব উপাদান তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সমাজজীবনের ঐক্যকে সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে। ওঁরাও জাতির মধ্যে সমাজ ও সংস্কৃতিতে রয়েছে

দ্বৈতসত্তা। একদিকে রয়েছে আদিবাসী ঐতিহ্য, অন্যদিকে ধর্মান্তরিত হবার ফলে নতুন সংস্কৃতির প্রভাব। এভাবেই পাশাপাশি অবস্থানের ফলে বিভিন্ন জাতির লোকদের সাথে ওঁরাওদের মিশ্রণ ঘটে।

সাঁওতাল জাতির পরিচয়:

অস্ট্রিক ভাষাভাষী এই জনগোষ্ঠী উত্তর-পূর্ব ভারতের অঞ্চলে কীভাবে এবং কখন 'সাঁওতাল' নামে পরিচিত হলো, তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে নানা মতভেদ রয়েছে। Skrefsrud-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, 'সাঁওতাল' শব্দটির উৎপত্তি 'সুতার' (Soontar) শব্দ থেকে হয়েছে। অপরদিকে, কিছু গবেষক ধারণা করেন যে, দীর্ঘকাল সমতল বা 'ষাঁওত' ভূমিতে বসবাস করার কারণেই তাঁদের 'সাঁওতাল' নামে অভিহিত করা হয়। আরও কিছু গবেষক তাঁদের প্রাচীন জাতিগত নাম 'খেরওয়ার' হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় যে, এ জনগোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের 'সাঁওতাল'-এর পরিবর্তে 'সানতাল' বলে পরিচয় দিতে আগ্রহী, এবং নিজেদের মধ্যে তাঁরা একে অপরকে 'হড়' নামে ডাকেন, যার অর্থ 'মানুষ' (তরু,২০০৭)।

বাংলাদেশে সাঁওতালদের বসবাসের যাত্রা মূলত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশার পার্বত্য অঞ্চল থেকে শুরু হয়েছিল। তারা কৃষি মজুর, রেললাইন স্থাপনকারী এবং চা বাগানের শ্রমিক হিসেবে এসে প্রথমে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে বসবাস শুরু করে। তাদের আগমন মূলত ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পর শুরু হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে তারা উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী, দিনাজপুর, নওগাঁ, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বসতি স্থাপন করে। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর তথ্যমতে, বাংলাদেশে বর্তমানে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যা ১২৯,০৫৬ জন। এর মধ্যে, দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী সাঁওতালদের সংখ্যা ৪১,০৭৯ জন (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২২)।

সাঁওতালরা মূলত কৃষিজীবী; তবে অনেকে চা বাগানেও শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণে সব পরিবার সব ধরনের কাজ করতে পারে না। সাঁওতাল সমাজ ১২টি গোত্র বা 'পারিস'-এ বিভক্ত, যেগুলির প্রতিটি আবার একাধিক উপগোত্রে বিভাজিত। তাঁদের ধর্মবিশ্বাস সর্বপ্রাণবাদী প্রকৃতিনির্ভর; তারা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে এবং দেবতাকে 'বোঙ্গা' নামে আহ্বান করে। হিন্দু দেবদেবীর প্রভাবও তাঁদের বিশ্বাস ব্যবস্থায় দৃশ্যমান। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তাঁরা 'ঠাকুর জিউ'-কে মান্য করেন। সমাজে সংঘটিত অপরাধ বিচার তাঁরা নিজেদের সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই সম্পন্ন করেন–গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে 'ল'বীর' বা জঙ্গল মহাসভা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের সভা এ বিচার পরিচালনা করে (তরু, ২০০৭)।

সাঁওতাল সমাজ পিতৃপ্রধান; সম্পত্তির অধিকার পুত্রদের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হয়, মেয়েরা এতে অধিকারী নয়। সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য হলো ভাত। এর পাশাপাশি তাঁরা শাকসবজি, গরু, মহিষ, শুকর ও বন্য প্রাণীর মাংস, বিভিন্ন প্রকারের মাছ, ফলমূল, দুগ্ধজাত খাবার এবং নানা রকমের পিঠাপুলি খেতে পছন্দ করেন। পিঠার মধ্যে বিশেষ করে 'চিতাপিঠা' তাঁদের সবচেয়ে প্রিয় (আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা, ১৯৮৫)। এছাড়া, সাঁওতাল নারী-পুরুষ উভয়েই নিজেদের তৈরি দেশীয় মদ 'হাঁড়িয়া' পান করতে অভ্যস্ত।

পোশাকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অতীতে সাঁওতাল পুরুষেরা সাধারণত সাদা থানকাপড়ের ধুতি পরিধান করতেন। বর্তমানে অধিকাংশ পুরুষ লুঙ্গি ব্যবহার করেন, আর শিক্ষিত তরুণেরা শার্ট ও প্যান্ট পরিধান করেন। সাঁওতাল নারীরা আগে 'ফতা' নামে পরিচিত দুটি মোটা কাপড় ব্যবহার করতেন–এর একটি কোমর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত নিম্নাঙ্গ আবৃত রাখত, অন্যটি বক্ষদেশ ঢেকে স্কন্ধ পেরিয়ে পিঠ বরাবর ঝুলে থাকত। তবে বর্তমানে বয়স্ক দু-একজন নারী ছাড়া ঐতিহ্যবাহী এই পোশাক আর তেমন দেখা যায় না। আধুনিক প্রজন্মের নারীরা এখন সালোয়ার-কামিজ ও শাড়ি পরিধান করে থাকেন। এর

সাথে তারা গলাইয় মান্দালি নামের হাঁসুলি মালা ও তাবিজ, কানে দুল, নাকে নথ ও মাকড়ি, সিঁথিপাটি, হাতে বালা, চুড়ি ও বটফল, বাহুতে বাজু, কোমরে বিছা না হাড়াহাড়ি, পায়ে বাঙ্কী, হস্তাঙ্গুলে অঙ্গুরি এবং পদাঙ্গুলে বটরি পরিধান করে থাকেন (তরু, ২০০৫)।

তাঁদের গৃহনির্মাণেও স্বকীয়তা দেখা যায়–দেয়াল মাটির, ছাউনি শন বা খড়ের, এবং প্রায়ই নকশা ও রঙে সজ্জিত (তরু,২০০৭)। চিকিৎসায় তাঁরা ওঝা-নির্ভর, যিনি মন্ত্র, গাছগাছড়া ও ঝাড়ফুঁক ব্যবহার করেন (তরু,২০০৭)। বিবাহ সাঁওতাল সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বন্ধন, যা সম্পূর্ণরূপে লোকাচারনির্ভর। একই গোত্র বা উপগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। সমাজে বিধবা বিবাহ ও তালাকপ্রথা উভয়ই বিদ্যমান; তালাকপ্রাপ্তা নারীকে 'ছাডউই' বলা হয় (তরু,২০০৭)। সাঁওতালরা অত্যন্ত উৎসবপ্রিয়। তাঁদের বছর গণনা ফাল্গুন মাস থেকে শুরু হয় এবং মাঘ পর্যন্ত বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উদযাপিত হয়। প্রধান উৎসবগুলির মধ্যে বাহা, হোম, এরো, হাড়িয়াও, ছাড়া, দিবি, নবান্ন, ও সোহরাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (জলিল, ২০০৩)।

সাঁওতালী ভাষা মূলত মৌখিক ঐতিহ্যনির্ভর, যার লিখিত বর্ণমালা নেই। তবে মিশনারিদের উদ্যোগে ভাষাটির লিপিবদ্ধকরণ, অভিধান সংকলন ও লোকসাহিত্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে অনেক সাঁওতাল দ্বিভাষিক–তারা সাঁওতালী ও বাংলা উভয় ভাষায় দক্ষ এবং তাঁদের ভাষায় বহু বাংলা শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সমগ্র সাঁওতাল সমাজের ধর্ম, ভাষা, শিল্প, উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক, যা এখনো সামাজিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে টিকে আছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় বিভিন্ন প্রাথমিক এবং দ্বিতীয়ক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য দিনাজপুর জেলার ১৬ জন ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এই সাক্ষাৎকারে দিনাজপুর জেলায় খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর মিশনারী কার্যক্রমের প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সাক্ষাৎকারসমূহ ১ লা মার্চ ২০২৫ থেকে ২০ শে মার্চ ২০২৫ এর মধ্যে অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ গৃহে গিয়ে সরাসরি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি সাক্ষাৎকার শুরুর পূর্বে অংশগ্রহণকারীদের গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং তাঁদের অবহিত সম্মতি গ্রহণ করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের আশ্বস্ত করা হয় যে তাঁদের পরিচয় গোপন রাখা হবে এবং প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হবে। গড়ে প্রতিটি সাক্ষাৎকারের সময়কাল ছিল ৩০ থেকে ৪০ মিনিট। অংশগ্রহণকারীদের পূর্বানুমতির ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারগুলো অডিওরূপে রেকর্ড করা হয়, যা পরবর্তী পর্যায়ে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গবেষণার জন্য দ্বিতীয়ক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার প্রতিবেদন, প্রকাশনা, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি উন্নয়ন সংক্রান্ত বই এবং পূর্ববর্তী গবেষণা প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যগুলি গুণগত পদ্ধতিতে বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন থিম বা বিষয়বস্তু চিহ্নিত করে সে সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

সারণি-১ : *জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য*

		অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	*শতকরা হার*
লিঙ্গ	পুরুষ	৮	৫০%
	মহিলা	৮	৫০%
বয়স	১৮-২৫	৪	২৫%
	২৫-৩৪	৬	৩৮%
	৩৫-৪৪	৩	১৯%
	৪৫-৫৪	৩	১৯%
সম্প্রদায়	সাঁওতাল	৮	৫০%
	ওঁরাও	৮	৫০%
পেশা	কৃষক	৬	৩৮%
	ব্যবসায়ী	২	১৩%
	দিনমুজুর	১	৬%
	গৃহিনী	৩	১৯%
	দর্জি	১	৬%
	শিক্ষার্থী	৩	১৯%
শিক্ষাগত যোগ্যতা	নিরক্ষর	২	১৩%
	প্রাথমিক	২	১৩%
	মাধ্যমিক	৭	৪৪%
	উচ্চ-মাধ্যমিক	৪	২৫%
	উচ্চশিক্ষা	১	৬%
বসবাসের সময়কাল	১-২০	৪	২৫%
	২১-৩০	৭	৪৪%
	৩১-৪০	৩	১৯%
	৪১-৫০	২	১৩%

এই গবেষণায় মোট ১৬ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন, যেখানে সমসংখ্যক নারী ও পুরুষ অংশগ্রহণ করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের বয়স বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক অংশগ্রহণকারী ২৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সসীমার মধ্যে (৩৮%), যা যুব সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণকে নির্দেশ করে। এছাড়া থেকে ১৮-২৫ বছর বয়সের ২৫% এবং ৩৫-৫৪ বছর বয়সসীমায় মোট ৩৮% অংশগ্রহণকারী ছিলেন, যা বয়সভিত্তিক বৈচিত্র্য নিশ্চিত করে। সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশগ্রহণে সমতা বজায় ছিল–সাঁওতাল ও ওঁরাও সম্প্রদায় থেকে সমান সংখ্যক (৫০% করে) অংশগ্রহণকারী অংশ নিয়েছেন, যা গবেষণায় দুইটি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করেছে। পেশাগত পটভূমিতে দেখা যায়, সর্বাধিক অংশগ্রহণকারী ছিলেন কৃষিজীবী (৩৮%), যা এলাকাটির কৃষিনির্ভর অর্থনীতির প্রতিফলন। এছাড়া ব্যবসায়ী (১৩%), দৈনিক মজুর, গৃহিণী, দর্জি ও শিক্ষার্থী–প্রতিটি শ্রেণি থেকে কিছুসংখ্যক অংশগ্রহণকারী ছিলেন, যা পেশাগত বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী (৪৪%) মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেছেন। উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে রয়েছে ২৫% এবং উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত মাত্র একজন (৬%)। তবে এখনো ১৩% অংশগ্রহণকারী নিরক্ষর রয়ে গেছেন, যা শিক্ষাগত উন্নয়নের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ নির্দেশ করে। অংশগ্রহণকারীদের বসবাসের সময়কাল বিশ্লেষণ

করলে দেখা যায়, ৪৪% ব্যক্তি ২১-৩০ বছর ধরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাস করছেন, যা তাদের অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় বাস্তবতার গভীর উপলব্ধিকে নির্দেশ করে। এর পাশাপাশি, স্বল্পমেয়াদী (১-২০ বছর) ও সর্বাধিক (৪১-৫০ বছর) বসবাসকারীদেরও উপস্থিতি রয়েছে।

সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে নিম্নোক্তসারণি ২ এ উপস্থাপিত বিষয়গুলোতে বিভক্ত করে বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

সারণি ২ : বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ

থিম	সাব-থিম	সংখ্যা	উদ্ধৃতি
১. সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রচেষ্টা	ঐতিহ্যবাহী উৎসব, গান, নাচ, পোশাক সংরক্ষণ	৮	"আমাদের ঐতিহ্যবাহী গান, নাচ, পোশাক এবং শিল্পকর্ম সংরক্ষণে সাহায্য করছে।"
	মাতৃভাষায় শিক্ষা ও অনুবাদ	৬	"আমাদের ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থ অনুবাদ করেছে যা ভাষা সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।"
	সংস্কৃতি ভিত্তিক বই ও অনুষ্ঠানের আয়োজন	৪	"আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে বই বের করেছে এবং উৎসব পালনে সহায়তা করছে।"
	সংস্কৃতি সংরক্ষণে আন্তরিকতা	২	"মিশনারী আমাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণে বিশেষভাবে কাজ করছে।"
	মিশ্র মনোভাব ও আধিপত্যের অভিযোগ	৪	"অনেকক্ষেত্রে আমাদের সংস্কৃতির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে।"
২. সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিবর্তন	মাতৃভাষার ব্যবহার কমে যাওয়া	৭	"অনেকে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে চায়, ফলে নিজেদের ভাষা কম ব্যবহৃত হচ্ছে।"
	ঐতিহ্য ও পোশাক পরিবর্তন	৪	"অনেকে ঐতিহ্যবাহী পোশাকের পরিবর্তে আধুনিক পোশাক পড়ছে।"
	ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিবর্তন	৪	"খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের ফলে আমাদের কিছু রীতিনীতি হারিয়ে যাচ্ছে।"
৩. ধর্মীয় কার্যক্রমের প্রভাব	একই সাথে শিক্ষা ও ধর্ম প্রচার	৬	"মিশনারী স্কুলগুলোতে শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়।"
	ধর্মীয় বিভেদ ও বিশ্বাসের পরিবর্তন	৩	"ধর্মান্তরের ফলে সমাজে কিছু বিভেদ দেখা দিয়েছে।"
	স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর	৪	"অনেকে নিজে হতেই অনুপ্রাণিত হয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করছে।"
৪. দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের চ্যালেঞ্জ	দ্বন্দ্বহীন সহাবস্থান	৫	"ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়নি।"
	বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সংঘাত	৭	"ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান নিয়ে কিছু ক্ষেত্রে বিরোধ তৈরি হয়েছে।"
	ভুল বোঝাবুঝি ও সাংস্কৃতিক দ্বিধা	৩	"কখনো কখনো আমাদের সংস্কৃতির প্রতি অসম্মানজনক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।"
৫. উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ভূমিকা	শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা	৮	"তারা আমাদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দেয়, স্বাস্থ্যসেবা দেয়।"
	ক্ষুদ্রঋণ ও কর্মসংস্থান	৬	"নারীরা কুটিরশিল্প শিখে আয় করে সংসারের উন্নতি ঘটাতে পারছে।"
	সামাজিক সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি	৫	"তাদের কার্যক্রম আমাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে।"
	সংস্কৃতি-সহায়ক উন্নয়ন চাহিদা	৪	"উন্নয়নমূলক কাজগুলো আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করেই হওয়া উচিত।"

সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রচেষ্টা

ঐতিহ্যবাহী উৎসব, গান, নাচ, পোশাক সংরক্ষণ

মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী উৎসব, গান, নাচ এবং পোশাক সংরক্ষণের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, মিশনারী সংস্থাগুলি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের ঐতিহ্য উদযাপনের জন্য উৎসব আয়োজন করে, যেখানে তারা ঐতিহ্য, ভাষা, নাচ, গান, পোশাক এবং সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে তা উদযাপন করে। একজন সাক্ষাৎকারীর বর্ণনা মতে, মিশনারীরা আমাদের ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলোর আয়োজন করে এবং আমাদের সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে (সাক্ষাৎকার ১, মার্চ ১৫, ২০২৫)। তাদের এই কার্যক্রমের ফলে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা এবং সামাজিক পরিচিতি বৃদ্ধি পায়। তবে কিছু ক্ষেত্রে মিশনারী কার্যক্রমের ফলে পুরনো সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ কমে গিয়ে নতুন সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। এক সাক্ষাৎকারে বলা হয়, এটা ঠিক যে মিশনারীরা আমাদের সংস্কৃতির প্রতি কিছু উদ্যোগ নিয়েছে, তবে কখনো কখনো তাদের কার্যক্রমে আমাদের ঐতিহ্যের ওপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে (সাক্ষাৎকার ৭, মার্চ ১৮, ২০২৫)।

মাতৃভাষায় শিক্ষা ও অনুবাদ

মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদান এবং ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ করা, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি ভাষার সংরক্ষণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। বেশ কিছু সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে যে, মিশনারী সংস্থাগুলি বাইবেলসহ অন্যান্য ধর্মীয় বইয়ের অনুবাদ করে, যা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি ভাষার সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একজন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী বলেন, মিশনারীরা আমাদের ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছে এবং এর মাধ্যমে আমাদের ভাষা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করছে (সাক্ষাৎকার ৯, মার্চ ২৫, ২০২৫)। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি ভাষা রক্ষায় নতুন দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়েছে এবং একধরনের সাংস্কৃতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার প্রতি প্রবণতা বাড়ছে, যার ফলে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি ভাষার ব্যবহার কমে যাচ্ছে। আরেকজন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী বলেন, আমাদের ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, কারণ আজকাল অনেক মানুষ ইংরেজি বা বাংলা শিখতে আগ্রহী (সাক্ষাৎকার ৬, মার্চ ২০, ২০২৫)।

সংস্কৃতি ভিত্তিক বই ও অনুষ্ঠানের আয়োজন

মিশনারী সংস্থাগুলি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণের জন্য বই প্রকাশ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে বলা হয়েছে যে, মিশনারীরা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ভাষা নিয়ে বই প্রকাশ করেছে এবং সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নানা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। একজন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী জানান, মিশনারীরা আমাদের সংস্কৃতির উপর বই প্রকাশ করেছে এবং আমাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সচেতনতা তৈরি করার জন্য নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে (সাক্ষাৎকার ৮, মার্চ ২২, ২০২৫)। এর ফলে, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সংস্কৃতি সংরক্ষণের আগ্রহ বেড়েছে। তবে কিছু সাক্ষাৎকারে দাবি করা হয়েছে যে, মিশনারীদের কার্যক্রমের ফলে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একজন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী বলেন, অনেকে আমাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরতে আগ্রহী নয় এবং অনেকেই আমাদের পুরনো গান ও নাচ ভুলে গেছে। কিছুটা পরিবর্তন এসেছে (সাক্ষাৎকার ১০, মার্চ ২৬, ২০২৫)। কিছুক্ষেত্রে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতি ভুলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে, যা মিশনারী কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হচ্ছে।

সংস্কৃতি সংরক্ষণে আন্তরিকতা

মিশনারী কার্যক্রমের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হলেও, কিছু ক্ষেত্রে তারা নিজেদের ধর্মীয় আদর্শের প্রচার করতে গিয়ে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। মিশনারী কার্যক্রম ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির প্রতি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও, কখনো কখনো তারা নিজেদের ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রচার করতে গুরুত্ব দিয়েছে, যা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিছু সংখ্যক সাক্ষাৎকারে যেমনটা বলা হয়েছে যে, "মিশনারীরা আমাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণে সহায়তা করছে, তবে কিছু ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় কার্যক্রম আমাদের সংস্কৃতির সাথে মানানসই নয়" (সাক্ষাৎকার ৪, মার্চ ২১, ২০২৫)। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে মিশনারী কার্যক্রম সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য আন্তরিকভাবেই কাজ করছে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির পোশাক এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতি রক্ষায়।

মিশ্র মনোভাব ও আধিপত্যের অভিযোগ

মিশনারী কার্যক্রমের প্রতি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও কখনও মিশ্র মনোভাব দেখা গেছে। কিছু সাক্ষাৎকারে বলা হয়েছে যে, মিশনারীরা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির প্রতি সাহায্য করলেও, মাঝে মাঝে তারা নিজেদের সংস্কৃতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। একজন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী জানান, মিশনারীরা আমাদের সংস্কৃতির প্রতি কিছু উদ্যোগ নিয়েছে, তবে কখনো কখনো তাদের কার্যক্রমে আমাদের ঐতিহ্যের ওপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা দেখা গেছে (সাক্ষাৎকার ৭, মার্চ ১৮, ২০২৫)। তারা সংস্কৃতির পরিবর্তন করতে চাইলেও, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি জনগণ তাদের ঐতিহ্য রক্ষা করতে চায়। এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিশনারীরা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের নিজেদের বিশ্বাস এবং ধর্মীয় রীতি-নীতির পরিবর্তে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছে, যা একটি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিরোধ সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে একজন বলেন, মিশনারীরা আমাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছে, যা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে (সাক্ষাৎকার ৫, মার্চ ১৭, ২০২৫)।

সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিবর্তন

মাতৃভাষার ব্যবহার কমে যাওয়া

মিশনারী কার্যক্রমের প্রভাবে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃভাষার ব্যবহার ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। বিশেষত, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগের ফলে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি ভাষার ব্যবহার কমে যাচ্ছে। বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে যে, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজে বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে, যার ফলে তাদের নিজস্ব ভাষা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এক সাক্ষাৎকারে একজন প্রতিক্রিয়া দানকারী বলেন, আমাদের ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, কারণ আজকাল অনেক মানুষ ইংরেজি বা বাংলা শিখতে আগ্রহী (সাক্ষাৎকার ৬, মার্চ ২০, ২০২৫)। মিশনারী কার্যক্রমের অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা নয়, আধুনিক ভাষাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি ভাষার অস্তিত্বের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রেও মিশনারী সংস্থাগুলি মাতৃভাষায় শিক্ষা দান ও সাংস্কৃতিক উপকরণ তৈরি করে ভাষা সংরক্ষণে চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এই প্রক্রিয়াটি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের ঐতিহ্য এবং ভাষার প্রতি অপর্যাপ্ত গুরুত্ব এবং আধিপত্যের প্রকাশ হতে পারে, যার ফলে ভাষা সংরক্ষণের বিষয়টি সংকটে পড়ছে। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি ভাষা সংরক্ষণে মিশনারীদের প্রতি আরও বেশি আন্তরিকতার প্রয়োজন।

ঐতিহ্য ও পোশাক পরিবর্তন

মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য এবং পোশাক পরিবর্তিত হয়েছে। বেশ কিছু সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, মিশনারীরা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের মাঝে আধুনিক পোশাকের

প্রচলন ঘটিয়েছে। অনেক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পড়তে আগ্রহী নয় এবং আধুনিক পোশাক পড়ার দিকে আগ্রহী হচ্ছে। একজন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী বলেন, অনেকে তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের পরিবর্তে আধুনিক পোশাক পড়তে শুরু করেছে (সাক্ষাৎকার ১০, মার্চ ২৬, ২০২৫)। এতে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজের ঐতিহ্যপূর্ণ পোশাক, যা তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ হারিয়ে যাচ্ছে। তবে, কিছু মিশনারী সংস্থা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করছে। তারা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি পোশাকের প্রদর্শন এবং উৎসবগুলোতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে। তবে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে দোলাচল দেখা যাচ্ছে। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিরা ঐতিহ্য বজায় রাখতে চাইলেও, আধুনিকতা ও বৈশ্বিক প্রবণতা তাদের সংস্কৃতি পরিবর্তনে বাধ্য করছে।

ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিবর্তন

ধর্মান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিশনারী কার্যক্রম ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতিতে গভীর পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজের অনেক সদস্য খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন, যার ফলে তাদের সংস্কৃতি, ধর্মীয় রীতি ও আচার-অনুষ্ঠানে পরিবর্তন এসেছে। বেশ কিছু সাক্ষাৎকারে জানা গেছে যে, ধর্মান্তরের ফলে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রাচীন ধর্মীয় রীতিগুলির পরিবর্তন ঘটেছে। একজন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী বলেন, খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাবে অনেকে আমাদের মধ্যে ঐতিহ্যগত ধর্ম ও বিশ্বাস থেকে সরে এসেছে এবং নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে (সাক্ষাৎকার ৭, মার্চ ২০, ২০২৫)। এছাড়া কিছু সম্প্রদায় তাদের পুরনো সংস্কৃতি থেকে খ্রিস্টান ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজেদের সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানগুলির প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। তবে, কিছু ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি ধর্মীয় নেতারা ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, যা তাদের সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিশ্বাসের সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ধর্মীয় কার্যক্রমের প্রভাব

একই সাথে শিক্ষা ও ধর্ম প্রচার

মিশনারী কার্যক্রমে শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষা একসাথে প্রদান করা হয়। মিশনারী স্কুলগুলোতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষাও দেওয়া হয়, যা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির ওপর প্রভাব ফেলেছে। সাক্ষাৎকারে একজন অংশগ্রহণকারী বলেন, মিশনারী স্কুলগুলিতে শুধুমাত্র সাধারণ শিক্ষা নয়, ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়, যা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির ওপর প্রভাব ফেলেছে। (সাক্ষাৎকার ৬, মার্চ ২২, ২০২৫)। এই ধারায় ধর্মীয় শিক্ষা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এর ফলে কিছু ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি তাদের পুরনো ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে সরে গিয়ে খ্রিস্টান ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে, যা সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত অংশ হারানোর কারণ হয়েছে।

ধর্মীয় বিভেদ ও বিশ্বাসের পরিবর্তন

মিশনারী কার্যক্রমের ফলে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে, কারণ অনেক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি নিজেদের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। এই ধর্মীয় বিভেদ কিছু সমাজে সামাজিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছে। একজন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী বলেন, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ফলে অনেক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায় তাদের প্রথাগত ধর্মীয় আচার ও উৎসব পালন বন্ধ করেছে। (সাক্ষাৎকার ৪, মার্চ ১৮, ২০২৫)। এর ফলে সমাজে ধর্মীয় বিভাজন এবং সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া কিছু ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি বিশ্বাস করেন যে, খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ তাদের জন্য উন্নতি এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, যা তাদের সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তবে একাধিক সম্প্রদায়ে ধর্মীয় বিভেদ সমাজে একধরনের সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে।

স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর

মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে কিছু ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছে। ধর্মান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে, তবে এই ধর্মান্তর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় হয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে একজন ব্যক্তি বলেন, অনেকে স্বেচ্ছায় খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে, কারণ তারা এর শান্তির বার্তা এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছে (সাক্ষাৎকার ৯, মার্চ ২৪, ২০২৫)। এই ধর্মান্তর প্রক্রিয়া অনেক সময় সংস্কৃতির পরিবর্তন এবং কিছু ঐতিহ্য হারানোর সাথে যুক্ত হলেও ধর্মীয় শান্তি এবং নৈতিক শিক্ষা কিছু ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি জনগণের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে ধর্মান্তরের মাধ্যমে সংস্কৃতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং এতে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের পুরনো সংস্কৃতি এবং বিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের চ্যালেঞ্জ

দ্বন্দ্বহীন সহাবস্থান

মিশনারী কার্যক্রমের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি এবং মিশনারীদের মধ্যে দ্বন্দ্বহীন সহাবস্থান দেখতে পাওয়া গেছে। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজে কিছু ক্ষেত্রে মিশনারীদের কাজ ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে, ফলে তারা মিশনারীদের কার্যক্রমে কোনো সমস্যা দেখতে পাননি। সাক্ষাৎকারে একজন বলেন, এখনো তেমনভাবে কোনোপ্রকার দ্বন্দ্ব কিংবা সমস্যা সৃষ্টি হয়নি (সাক্ষাৎকার ৯, মার্চ ২৪, ২০২৫)। মিশনারীরা যখন ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি সহানুভূতির সাথে কাজ করে, তখন এটি দ্বন্দ্বহীন সহাবস্থানের একটি উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে কিছু ক্ষেত্রে মিশনারী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির পরিবর্তন এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের বিস্তার ঘটে, যা কিছু সম্প্রদায়ে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা মিশনারী কার্যক্রমে অংশ নিতে এক ধরনের দ্বিধা অনুভব করেন, কারণ তারা মনে করেন যে এটি তাদের ঐতিহ্য এবং জীবনধারাকে হুমকির মুখে ফেলে। কিছু ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিরা নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্মকে রক্ষা করতে চেয়ে মিশনারী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যা কখনও কখনও সামাজিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। তবে ব্যাপকভাবে, এমন অনেক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি রয়েছে যারা ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মিশনারীদের সহাবস্থানের দিকে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন।

বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সংঘাত

মিশনারী কার্যক্রমের ফলে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। মিশনারীরা যখন খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য কাজ করে, তখন ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজের প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির সাথে তার একটি বিরোধ তৈরি হতে পারে। সাক্ষাৎকারে একজন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস যেমন- প্রকৃতির পূজা বা আধ্যাত্মিকতার প্রতি প্রবণতা মিশনারী খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করেছে (সাক্ষাৎকার ৭, মার্চ ২৫, ২০২৫)। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আধ্যাত্মিক বিশ্বাসগুলি প্রকৃতি এবং পৃথিবীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে তৈরি। কিন্তু মিশনারীরা প্রাচীন ধর্মীয় প্রথা এবং বিশ্বাসগুলির পরিবর্তে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আগ্রহী করেছে, যা একধরনের সাংস্কৃতিক সংঘাত তৈরি করেছে। এছাড়া কিছু ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায় মিশনারী কার্যক্রমকে তাদের পুরনো ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির প্রতি অবমাননা হিসেবে দেখে। এই ধরনের সংঘাত মিশনারী কার্যক্রমের এক নেতিবাচক প্রভাব হতে পারে, যেখানে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক জীবন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ভুল বোঝাবুঝি ও সাংস্কৃতিক দ্বিধা

মিশনারী কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির মধ্যে মাঝে মাঝে ভুল বোঝাবুঝি এবং সাংস্কৃতিক দ্বিধা সৃষ্টি হয়। বিশেষত, মিশনারীরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আধুনিকতা প্রচারের চেষ্টা করলেও ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজের পুরনো সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন নাও হতে পারে। সাক্ষাৎকারে এক ব্যক্তি বলেন, আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে (সাক্ষাৎকার ১২, মার্চ ২৩, ২০২৫)। মিশনারী কার্যক্রম যখন ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজের আদি বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে কাজ করে না, তখন এটি সাংস্কৃতিক দ্বিধার সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া কিছু ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি তাদের সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য রাখতে চায়, কিন্তু মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে যেসব পরিবর্তন আনা হচ্ছে তা তাদের জন্য বিরোধপূর্ণ হতে পারে। এই ধরনের দ্বিধা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করতে পারে।

উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ভূমিকা

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা

মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের জীবনের মান উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মিশনারী সংস্থাগুলি বহু স্থানে স্কুল এবং হাসপাতাল স্থাপন করেছে, যা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের শিক্ষার সুযোগ এবং স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন করেছে। একজন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী বলেন, মিশনারী আমাদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছে, স্বাস্থ্যসেবা দিয়েছে এবং বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। (সাক্ষাৎকার ১০, মার্চ ২৬, ২০২৫)। এছাড়া মিশনারীরা স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের প্রচারণা চালিয়েছে এবং আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রদান করেছে, যা জীবনযাত্রার মান বাড়াতে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে তাদের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের পুরনো স্বাস্থ্যচর্চা ও প্রথার প্রতি অবহেলা সৃষ্টি করতে পারে।

ক্ষুদ্রঋণ ও কর্মসংস্থান

মিশনারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। মিশনারী সংস্থাগুলি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প চালু করেছে, যা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে সাহায্য করছে। এই বিষয়ে একজন বলেন, ক্ষুদ্র ঋণ ও দক্ষতার বুদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে আমরা আর্থিভাবে পূর্বের চেয়ে স্বচ্ছল হয়েছি। (সাক্ষাৎকার ১২, মার্চ ২৫, ২০২৫)। এছাড়া, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা হচ্ছে। তারা কুটির শিল্পের মাধ্যমে আয় করে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করতে পারছে। মিশনারীরা স্থানীয় অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছে, তবে কিছু লোক মনে করে যে, এই কাজগুলো ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

সামাজিক সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি

মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মিশনারীরা স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং সচেতনতামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে একজন বলেন, যুবক-যুবতীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে আয় করতে পারছে, নারীরা কুটিরশিল্পের মাধ্যমে আয় করে সংসারের উন্নতি ঘটাতে পারছে (সাক্ষাৎকার ১১, মার্চ ২২, ২০২৫)। এছাড়া মিশনারীরা এমন দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের মধ্যে চাকরি এবং ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা তাদের আর্থিক উন্নতি এবং জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

তবে এই উদ্যোগগুলো যদি সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব না দেয়, তবে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির ঐতিহ্য এবং পরিচয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে।

সংস্কৃতি-সহায়ক উন্নয়ন চাহিদা

মিশনারী কার্যক্রমে সংস্কৃতি-সহায়ক উন্নয়ন চাহিদা এবং সমন্বয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং আধুনিক উন্নয়ন সমন্বয় করার জন্য মিশনারীরা নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একজন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী বলেন, তাদের যে মাইক্রো-ক্রেডিট সিস্টেমটি আছে সেখানে আমরা টাকা জমাতে পারি (সাক্ষাৎকার ৯, মার্চ ২৪, ২০২৫)। মিশনারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম এবং মাইক্রোফাইন্যান্স সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হচ্ছে। তবে যখন সংস্কৃতির সঙ্গে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না তখন এটি এক ধরনের সামাজিক অস্থিরতা এবং সাংস্কৃতিক হুমকির সৃষ্টি করতে পারে।

ফলাফল পর্যালোচনা

গবেষণার ফলাফল থেকে এটি স্পষ্ট যে, মিশনারী কার্যক্রম ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা এবং সামাজিক কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। একটি দৃষ্টিকোণ থেকে মিশনারী কার্যক্রম ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির সংরক্ষণে কিছু ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে, যেমন উৎসব আয়োজন, ঐতিহ্যবাহী পোশাক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করেছে। তবে একই সঙ্গে আধুনিকতার প্রবাহের কারণে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির কিছু অংশ হারিয়ে গেছে, যা মিশনারী কার্যক্রমের পরোক্ষ প্রভাব হিসেবে দেখা যায়। ভারত ও নেপালের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনা করলে, সেখানে মিশনারী কার্যক্রম সংস্কৃতির পরিবর্তন এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সক্রিয় ছিল, যেখানে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজের ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি বড় অংশ বিলীন হয়ে গেছে (Hiebert, 2009). একইভাবে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশনারী কার্যক্রম আধুনিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রসারের মাধ্যমে তাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ কমিয়ে দিয়েছে। এই পরিবর্তনগুলো কেবল সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত করতে পারে, বরং ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের মধ্যে সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি করেছে, যা সামগ্রিকভাবে তাদের জীবনধারা এবং সম্প্রদায়কে সংকটে ফেলেছে।

ভাষা সংরক্ষণ একটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যেটি মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০২৪)। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ এবং স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা উপকরণ তৈরির মাধ্যমে মিশনারীরা ভাষার সংরক্ষণে কাজ করেছে (Brandt, 2011; De Rozario, 2011; Farid, 2023), তবে ভাষা সংরক্ষণের এই প্রচেষ্টার পরেও ভাষার ব্যবহার কমে গেছে। গবেষণার ফলাফলে উঠে এসেছে যে, আধুনিক ভাষাগুলোর প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধির ফলে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি ভাষা সংকটে পড়েছে এবং তা হারিয়ে যেতে শুরু করেছে (Thompson, 2012; Zene, 1993; Zene and Zene, 2014)। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজেও একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার দ্রুত কমে যাচ্ছে এবং ইংরেজি বা হিন্দি ভাষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে (Clarence et al., 2022; Verma, 2024)। এর ফলে, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি ভাষার ক্ষতি এবং তার সাংস্কৃতিক সংরক্ষণে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হচ্ছে, যা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজেও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মিশনারী কার্যক্রমের একটি বৃহৎ প্রভাব ধর্মান্তরের মাধ্যমে ঘটে (Ali and Nurullah, 2007), যেখানে অনেক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায় নিজেদের পুরনো ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে।

গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, ধর্মান্তরের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতিতে পরিবর্তন এসেছে, যা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করেছে। এই ধর্মীয় বিভাজন ভারতের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়েও দেখা যায়, যেখানে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের ফলে পুরনো ধর্মীয় বিশ্বাসে সংকট সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেক রীতিনীতি হারিয়ে গেছে (ইড়ংপয, ২০১১)। বাংলাদেশেও মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে একই ধরনের পরিবর্তন দেখা গেছে (আহমদ, ২০১৮), যেখানে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে উঠেছে। তবে কিছু ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নতি, যেমন শিক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতা লাভ করেছে এবং সেই সাথে ধর্মীয় শান্তির বার্তা গ্রহণ করেছে, কিন্তু এই পরিবর্তন কখনো কখনো সংস্কৃতির ক্ষতির কারণও হতে পারে।

মিশনারী কার্যক্রমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান। গবেষণার ফলাফল অনুসারে, মিশনারী সংস্থাগুলি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়কে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে, যা তাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে (ROSSI et al., 2003)। মিশনারী স্কুল এবং হাসপাতালগুলো তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করেছে, তবে এই কার্যক্রমের মাঝে সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব কিছু এলাকায় সাংস্কৃতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। Thompson (2012) তার গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, যখন উন্নয়ন কার্যক্রম সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে আধুনিক উন্নয়ন ধারণায় সীমাবদ্ধ থাকে, তখন এটি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজের মধ্যে বিভেদ এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি হলেও, তাদের ঐতিহ্যগত জীবনধারার প্রতি সমর্থন এবং শ্রদ্ধা কমেছে। যা কিছু সম্প্রদায় মনে করে যে, এটি তাদের সংস্কৃতি ধ্বংস করছে। এছাড়া মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে, বিশেষত ক্ষুদ্রঋণ এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে। মিশনারী সংস্থাগুলি ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প চালু করে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি জনগণকে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়েছে, যা তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করতে সাহায্য করেছে। তবে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলেও, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি হুমকি সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষত যখন আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি ঐতিহ্য একে অপরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় (তবহব, ১৯৯৩)। তাই, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ এবং আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি, যাতে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজের ঐতিহ্যকে রক্ষা করা যায়।

এই গবেষণার প্রধান সীমাবদ্ধতা হল যে, এটি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর সীমাবদ্ধ এবং তাই এর ফলাফল পুরো দেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। ভবিষ্যতে এই ধরনের গবেষণাটি আরও বৃহত্তর আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে পরিচালনা করা যেতে পারে, যাতে মিশনারী কার্যক্রমের প্রভাব এবং ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির সাথে এর সম্পর্ক আরও বিস্তারিতভাবে বোঝা যায়। এতে মিশনারী কার্যক্রমের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব এবং ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির প্রতি আধুনিকতার প্রভাবের বিষয়ে আরও গভীর বিশ্লেষণ সম্ভব হবে। গবেষণার ভবিষ্যত দৃষ্টিকোণ থেকে, মিশনারী কার্যক্রমের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় প্রভাব নিয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন, যার ফলে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজে উন্নয়ন এবং সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা যায়।

উপসংহার

এই গবেষণার মাধ্যমে মিশনারী কার্যক্রমের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা এবং সামাজিক কাঠামোর ওপর যে প্রভাব পড়েছে তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। মিশনারী কার্যক্রম একদিকে কিছু সংস্কৃতির সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে, যেমন ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করা, ঐতিহ্যবাহী উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং ভাষা

সংরক্ষণের প্রচেষ্টা নেওয়া। কিন্তু অপরদিকে মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে আধুনিকতার প্রবাহ এবং ধর্মীয় পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হারিয়ে গেছে। এতে সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ কমে গিয়ে নতুন ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়ে সমাজে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে, যা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজে বিভক্তির দিকে পরিচালিত করেছে। এছাড়া মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ক্ষুদ্রঋণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, যা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে। তবে এই উন্নয়ন কর্মসূচির মাঝে সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ না দেওয়ার ফলে অনেক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি তাদের ঐতিহ্য এবং আচার-অনুষ্ঠান হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং মিশনারী কার্যক্রমের প্রভাব একদিকে উন্নয়নের সূচনা করলেও, অন্যদিকে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছে, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা ও ঐক্যকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।

মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আরও বেশি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার প্রয়োজন রয়েছে। মিশনারী সংস্থাগুলির উচিত স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করা এবং তাদের কার্যক্রমে স্থানীয় ঐতিহ্য, ভাষা ও বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেখানো। এছাড়া ধর্মান্তরের সময়, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় সহনশীলতার মানদণ্ড তৈরি করা উচিত, যাতে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য রক্ষা করা যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সমাজের ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সংরক্ষণে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। মিশনারী কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের আর্থিক উন্নয়ন হলেও, তা যদি সংস্কৃতির প্রতি অবহেলা করে হয়, তবে তা দীর্ঘমেয়াদে সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত করবে। ভবিষ্যতে মিশনারী কার্যক্রমের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় প্রভাব নিয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণা করা উচিত, যাতে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যায়।

সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার ১: শ্রী. মিলন টপ্য (৩৩), পেশা- কৃষক

সাক্ষাৎকার ২: শ্রী. জীবন এক্কা (৪২), পেশা- কৃষক

সাক্ষাৎকার ৩: শ্রী. শিমন লাকড়া (৩০), পেশা- কৃষক

সাক্ষাৎকার ৪: শ্রী. বিরসা এক্কা (৫১), পেশা- ব্যবসায়ী

সাক্ষাৎকার ৫: শ্রীমতী. রঞ্জিতা এক্কা (৩৮), পেশা- গৃহিণী

সাক্ষাৎকার ৬: শ্রীমতী. বান্দি খাঁখাঁ (৩৬), পেশা- গৃহিণী

সাক্ষাৎকার ৭: শ্রীমতী. বুদি টপ্য (৩১), পেশা- দর্জি

সাক্ষাৎকার ৮: শ্রীমতী. বিনা কুজুর (২১), পেশা- শিক্ষার্থী

সাক্ষাৎকার ৯: লিমা সরেন (৫০), পেশা- গৃহিণী

সাক্ষাৎকার ১০: মারিয়া মূর্মু (২৯), পেশা- কৃষক

সাক্ষাৎকার ১১: আলবিনা টুডু (১৯), পেশা- শিক্ষার্থী

সাক্ষাৎকার ১২: জোয়ান্না হেমব্রোম (২৪), পেশা- শিক্ষার্থী

সাক্ষাৎকার ১৩: রবি হাঁসদা (৩৪), পেশা- ব্যবসায়ী

সাক্ষাৎকার ১৪: জুলিয়ান মার্ডি (৪৬), পেশা- কৃষক

সাক্ষাৎকার ১৫: লিমন সরেন (৩০), পেশা- কৃষক

সাক্ষাৎকার ১৬: মিখায়েল টুডু (২৪), পেশা- দিনমুজুর

তথ্যসূত্র

Ali, M.Y. and Nurullah, A.S., 2007. Challenges of Islamic Da'wah in Bangladesh: The Christian Missions and Their Evangelization. *IIUC Studies*, 4, pp. 87–108. Available at: https://doi.org/10.3329/iiucs.v4i0.2857 [Accessed 06 Nov. 2025].

Bosch, D.J., 2011. *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*, 20th Anniversary ed. Orbis Books, Maryknoll, N.Y.

Brandt, C., 2011. Educating Santals: The Seventh-day Adventist Church in Joypurhat (Bangladesh) and the Issue of Cultural Alienation. Available at: https://doi.org/10.11588/xarep.00001784 [Accessed 06 Nov. 2025].

Clarence, M., Viju, P.D. and George, T.S., 2022. The Jesuit educational mission in rural Chotanagpur, India: historical achievements and contemporary challenges. *International Studies in Catholic Education*, 14, pp. 114–127. Available at: https://doi.org/10.1080/19422539.2019.1691826 [Accessed 06 Nov. 2025].

Dalton, E.T., 1872. *Descriptive Ethnology of Bengal*. Office of the Superintendent of Government Printing.

De Rozario, T., 2011. Christian mission and evangelization in Bangladesh. *Bangladesh e-Journal of Sociology*, 8, pp. 77–86.

Farid, M.S., 2023. Revisiting the aims of Catholic missionary education in Bangladesh: the case of Holy Cross Congregation. *International Studies in Catholic Education*, 15, pp. 148–166. Available at: https://doi.org/10.1080/19422539.2022.2146390 [Accessed 06 Nov. 2025].

Grierson, G.A., 1967. *Linguistic Survey of India*, First Reprint ed. Office of the Superintendent of Government Printing, India.

Hiebert, P.G., 2009. *The Gospel in Human Contexts: Anthropological Explorations for Contemporary Missions*. Baker Academic, Grand Rapids.

Kujur, A.A., 1989. *The Oraon Habitat, A Study in Cultural Geography*. Ranchi.

Rossi, C.D., Attanasio, A., Curto, S.D., D'Agostino, S., Castro, R.D., 2003. Treatment of Vaginal Atresia at a Missionary Hospital in Bangladesh: Results and Follow-up of 20 Cases. *The Journal of Urology*. Available at: https://doi.org/10.1097/01.ju.0000081425.66782.c7 [Accessed 06 Nov. 2025].

Shikdar, S., 2020. Historical Reflection: Bangladesh Christian Missions. Available at: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23072.20488 [Accessed 06 Nov. 2025].

Thompson, A., 2012. Exploring the Mission-Development Nexus Through Stories from Christian 'Missionaries' in Bangladesh. *Thesis*, Open Access Te Herenga Waka-Victoria University of Wellington. Available at: https://doi.org/10.26686/wgtn.17003368.v1 [Accessed 06 Nov. 2025].

Verma, D.N., 2024. Christian Missionaries in India, Conversion, and Tribes: Understanding Goals and Means, in: *The Routledge Handbook of Tribe and Religions in India*. Routledge India.

Zene, C., 1993. The authority of the face: Missionary representations in south-west Bangladesh. *History and Anthropology*.

Zene, D. and Zene, C., 2014. *The Rishi of Bangladesh: A History of Christian Dialogue*. Available at: https://doi.org/10.4324/9781315029122 [Accessed 06 Nov. 2025].

আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা, ১৯৮৫. *আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক পরিসংখ্যান*. মহিষ বাথান, রাজশাহী।

আহমদ, মুফতী যুবায়ের, ২০১৮. *বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয়*. হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী।

জনকণ্ঠদৈনিক, ২০২৪. বাংলা ভাষার উন্নয়নে খ্রিস্টান মিশনারি. *দৈনিক জনকণ্ঠ*. Available at: https://www.dailyjanakantha.com/opinion/news/714434 [Accessed 06 Nov. 2025].

জলিল, ড. মুহম্মদ আব্দুল, ২১-০৭-২০০৩. বাংলাদেশের আদিবাসী ওঁরাওদের মাতৃভাষা শাদরীতে শিক্ষা কার্যক্রমঃ একটি প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা, প্রবন্ধ. রাজশাহী, পৃ. ৩।

জলিল, ড. মুহম্মদ আব্দুল, ২০০৩. *বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি*. বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

তরু, মাযহারুল ইসলাম, ২০০৭. সাঁওতাল, ইনঃ মেসবাহ কামাল, জাহিদুল ইসলাম, সুগত চাকমা (সম্পাদকগণ), বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা - ৫ঃ আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পৃ. ৩২২-৩৪২. ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

তরু, মাযহারুল ইসলাম, ২০০৭. ওঁরাও, ইনঃ মেসবাহ কামাল, জাহিদুল ইসলাম, সুগত চাকমা (সম্পাদকগণ), বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা - ৫ঃ আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পৃ. ২২২-২৪৩. ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

তরু, মাযহারুল ইসলাম, ২০০৫. *চাঁপাইনবাবগঞ্জঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য*. জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা, ঢাকা।

আলী, মেহরাব, ২০০২. *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র-৫: দিনাজপুর শহর ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি*. দিনাজপুরঃ দিনাজপুরের ইতিহাস প্রকশনা প্রকল্প।

বাংলা পিডিয়া, ২০২৫. *দিনাজপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন চার্চ*. Available at: [https://bn.banglapedia.org/index.php?title=দিনাজপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন চার্চ] [Accessed 06 Nov. 2025].

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২২. জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২. [অনলাইনে] Available at: https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2024-01-31-15-51-b53c55dd692233ae401ba013060b9cbb.pdf [Accessed 06 Nov. 2025]।

[Abstract: The impact of missionary activities on indigenous communities in Dinajpur, the northern district of Bangladesh, has been profound, influencing their cultural, religious, linguistic, and social frameworks. These missionary interventions have led to significant changes, particularly in the cultural practices and religious beliefs of these communities. The primary aim of this research was to examine the cultural and societal changes within these indigenous communities in Dinajpur as a result of missionary activities. A qualitative research methodology was employed, with data collected through various interviews. The analysis reveals that while some aspects of indigenous culture have been preserved, many traditional practices have been lost due to the forces of modernity and religious conversion. Through the organization of cultural events, missionaries have also contributed to the preservation of certain cultural elements and traditions. However, the increasing trend of Christian

conversion has led to significant transformations in the traditions, languages, and belief systems of these communities. Furthermore, the study highlights that missionaries have provided the Santhal and Kurukh indigenous communities with the Bible in audio and application formats in their native languages. The research further underscores that missionary activities have led to notable improvements in education and healthcare services. Nevertheless, participants in the study emphasize that greater focus on the preservation of indigenous cultures and social integration is essential for fostering social and cultural equality.]